অবহেলিত উত্তরবঙ্গ

সৌমেন নাগ

উত্তরবঙ্গের অস্থির পদসঞ্চালনের কম্পন গঙ্গারদক্ষিণ সীমানা পার হয়ে লাল দিঘির পাড়ের লাল বাড়িতেওঅনুভুত হতে শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের যে মূল সমস্যা কেন্দ্রিকতা -- এটা এতদিনরাজ্যের অভিভাবকেরা কেউ ভাবনার বিষয় বলেভাবতে চাননি। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক পরিকল্পনা বলতে কলকাতা ,সংস্কৃতি বলতে কলকাতা, স্বাস্থ্য বলতে কলকাতা, সাহিত্য বলতে কলকাতা।এ যেন সেই রাজার কথা। রাজার হাসিই প্রজার হাসি, রাজার সুখইপ্রজার সুখ।

কলকাতাকে বিরোধিতাকরার জন্যই এই কথা - এমন ভাবার কারণ নেই। বরং কলকাতা এ রাজ্যের অত্যন্ত আপন । ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে কলকাতা যে ভাবে নানাসমস্যার ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে তাপ্রতিটি রাজ্যবাসীর ভাবনার কারণ। তবু কিন্তু পশ্চিমবাংলারপ্রান্ত জেলাগুলিতে বঞ্চনার ব্যাথা অভিমানে রূপান্তরিতহয়ে কলকাতার অভিভাবকত্বকে অস্বীকার করতে চাইছে। একটা ধারণা ক্রমশযেন দানা বেঁধে উঠেছে যে কলকাতার ঔপনিবেশিক আত্মম্ভরিরতাই এই পিছিয়ে পড়া জেলাগুলির অর্থনৈতিক ওসাংস্কৃতিক বিকাশের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। তাদেরস্বাধীন জাতিসত্তা বিকাশের জন্য ঔপনিবেশিক কলকাতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াছাড়া যেন দ্বিতীয়কোনও পথ নেই।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এইরাজ্যের অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিতহয়কলকাতা থেকে । কর্তৃত্ববাদের রথে চড়তে অভ্যস্ত কর্তৃত্ববাদীরা যেমন তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিককর্তৃত্বের অধিকার ভাগ করতে রাজীনয় তেমনি সাংস্কৃতিক জগতের কর্তৃত্ববাহী রথের একচেটিয়া আরোহীরা এতদিন ধরে যে সাংস্কৃতিকঅভিভাবত্বের একচ্ছত্র অধিকার ভোগ করে আসছিল তারা কোন ভাবেই তাদের কর্তৃত্বের রথে,প্রান্তভূমিতে গড়ে ওঠা নব্যশিক্ষিত ও মধ্যবিত্তের ভাষা ও সংস্কৃতির বাহকদের (যারা তাদের জাতিসত্তার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাপেতে চায়) জায়গা দিতে চায় না। শাস্ত্র পাঠ যেমন ব্রাহ্মণদেরএকচেটিয়া অধিকার ছিল তেমনি রাজধানী কেন্দ্রিক এই সাংস্কৃতিক জগতেরঅভিভারকেরা রাজ্যের সংস্কৃতিকে তাদের অভিভারকত্বেই রেখে দিয়েছে।তাই পশ্চিমবঙ্গে কলকাতার পাশাপাশি অপর কোনও কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। গড়ার যেপ্রয়োজন ছিল সে কথা ভাবারতাগিদ ও ছিল না।

অতীতের বাংলা আজকের বাংলা

অথচ অবিভক্ত বাংলা কিন্তু এরকম এককেন্দ্রিক রাজ্য ছিলনা। কলকাতা প্রধান কেন্দ্র থাকলেও ঢাকা ছিল অপরপ্রধান সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র । কলকাতা স্বীকৃতি দিতে দ্বিধাকরলেও সকলে জানত ঢাকা আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেঘনাদ সাহা থাকলে ঢাকারগর্ব ছিল সত্যেন বসু। অন্যদিকে, কোচবিহার ছিল পৃথক করদ রাজ্য।কলকাতা ও ঢাকা রাজধানী কোচবিহারকে তাদের সংস্কৃতির বর্ণচ্ছটায়আলোকিত করেছে এতে সন্দেহ নেই তবে কর্তৃত্ব করার কোনও সুযোগ ছিল না।এর অন্যতম কারণ, কোচবিহার জেলার জনজীবন, তার ইতিহাস এবং সংস্কৃতিতেবাংলার প্রভাব ছাড়াও আসামের প্রভাব ছিল গভীর। এর প্রমাণকোচবিহার রাজ্যকে দেশের অন্য করদ রাজ্যগুলির মতো ভারতভুক্ত হতে হয়নি। আসাম না বাংলা, কোন প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবেতা স্থির করতেই সময় লেগেছিল প্রায় তিন বছর। (কোচবিহারপশ্চিমবাংলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি)।

স্বাধীনতার পর শুধু যে রাজনৈতিক ক্ষমতাইকলকাতা কেন্দ্রিক হয়ে গেল তাই নয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রও হয়ে গেলকলকাতা নির্ভর। যেহেতু রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কেন্দ্র করলেই অর্থনৈতিকপরিকল্পনাগুলি রূপায়িত হয়, তাই পশ্চিমবাংলার যা কিছু অর্থনৈতিকপরিকল্পনা তার সব কিছুই পায়িত হল গঙ্গার ওপারে ---হাওড়া, হুগলি, ২৪পরগণা, বর্ধমান ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে। অথচ বাংলারদক্ষিণ ভাগের সঙ্গে উত্তর ভাগেরভৌগোলিক দূরত্বকে সুগম করার জন্য যে কর্মসূচি নেওয়ার কথা ছিল, তা ভাবাহল না ভাবা হল না উত্তরবঙ্গের তুলনাহীন জনবিন্যাসের জন্য এখানকার জটিলমানসিকতাকে কাছে টেনে আনার প্রয়োজনীয়তাকে। খেয়াল রাখাউচিত, একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলাতেই আছে ১৫১ টি স্বতন্ত্র মাতৃভাষা।

যাঁরা কলকাতার যাত্রাপথে মনিহারি ঘাট পারহবার স্মৃতিকে মনে রেখেছেন, তাঁরা তাঁদের সেই বিভীষিকায়স্মৃতির নিরিখে উপলব্ধি করতেপারেন যে, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কলকাতারদূরত্ব শুধু যে ভৌগোলিক ছিল তা নয় । এই দুর্গম যাত্রা পথ যে কলকাতার সঙ্গেউত্তরবঙ্গের মানসিক দূরত্বকে ভয়ঙ্কর গতিতে বাড়িয়ে তুলেছিল, তাবাংলার নয়া অভিভাবকেরা ভাবেননি । প্রশ্ন উঠতে পারে,ফারাক্কা ব্যারাজ তো এই ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দিয়েছে। এখানেই এক ভয়ংকরসত্যের মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা। আজকের এই ফারাক্কা ব্যারাজ অদূরভবিষ্যতে পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ ও উত্তরভাগের দ্বন্দ্বেরএক প্রধান ভূমিকা নিয়ে উপস্থিত হতে পারে । আজ এটা স্পষ্টযে ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণের পেছনেউত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নটি আদৌ ছিল না। বরং উত্তরবঙ্গের মালদহের অস্তিত্বের বিনিময়ে কলকাতাবন্দরের জীবনশক্তিকে উদ্ধার করার মানসিকতাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।তাই সেদিন নদী বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তাকে উপেক্ষা করেই ফারাক্কা সেতুরপরিবর্তে ফারাক্কা ব্যরাজ নির্মাণ করা হয়েছিল ।ফলে, মালদহ জেলার একের পর এক গ্রাম আজ গঙ্গার জলে তলিয়ে যাচ্ছে। গঙ্গা আজস্পষ্টভাবে জানান দিয়ে চলেছে যে, সে তার গতিপথ পরিবর্তন করেমানুষের ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে চাইছে। নদীর এই আক্রোশের সম্ভাবনারকথা নদীবিজ্ঞানী কপিল ভট্টাচার্য তো ফারাক্কা ব্যার

াজ নির্মানের আগেই জানিয়েছিলেন।

ফারাক্কা ব্যারাজ ঃ একটি মরণফাঁদ

পাছে কথাগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদীর ভাবনা বলেপ্রচার পায় তাই ফারাক্কা ব্যারাজের প্রতি একটু দৃষ্টিফেরানো যাক। পৃথিবীর এই দীর্যতম ব্যারাজ (দৈর্ঘ্য ৭৩৬৬ ফুট) নির্মিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে । এতে আছে৬০ ফুট বিস্তৃত ১০৯টি স্লুইস (Sluice) বা জল নির্গমনের দ্বার। ফারাক্কা ব্যরাজেরউজানে ২৬ মাইল লম্বা এবং ৬০০ ফুট চওড়া একটা খাল (Feeder Canal) কেটে জঙ্গীপুরে ভাগীরথী নদীর সঙ্গে যুক্তকরা হয়েছে। উদ্দেশ্য, গ্রীষ্মকালের শুষ্ক দুটি মাস ছাড়া গঙ্গা থেকেএই খালের মাধ্যেমে ভাগীরথী - হুগলী নদীর খাতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ৪০ হাজারকিউ সেক (প্রতি সেকেন্ডে৪০ হাজার ঘন ফুট) জলপ্রবাহিত করা। নির্মাণ ব্যয় ছিল ২০০ কোটি টাকা।

১৯৬৬ সালে ফারাক্কাব্যারাজ নির্মাণের সময় গঙ্গা নদী মাঝে একটা চর সৃষ্টি করে দুপাশে দুটি খাত দিয়ে বয়ে চলত।চর ও খাত দুটির মধ্যে উচ্চতারপার্থক্য ছিল ২০ফুটের মত। ফারাক্কা ব্যারাজের স্লুইসগুলির নীচের ভিতটি মাঝের চর থেকে ৮ ফুট উঁচুতেরাখা হয়েছিল । এর ফলে কংত্রিটের ভিতটি দু - পাশে গভীর খাত দুটিথেকে প্রায় ১৮ ফুট উঁচু হয়ে দাঁড়াল। এর প্রতিত্রিয়ায়ব্যারাজের উজানে বা ব্যারাজ - পন্ডে(Barrage Pond) জলের স্রোত কমে যাওয়ায় যে বালি ও পলি গঙ্গার গর্ভে ঝরেপড়তে শু করেছিল, তা ব্যারাজের উঁচু কংত্রিটের ভিতের জন্য স্রোতের সাহায্যে সরে যেতে পারল না।এইভাবে বছরের পর বছর পলি জমে গড়ে উঠেছে কয়েক মাইল জুড়ে বিশালচর। ডান দিকে আছে ফিডার ক্যানাল। এদিককার ২৪টি স্লুইসের কংত্রিটেরভিত অন্যগুলিত তুলনায় ৫ ফুট নিচু, তাই জলের গতি বেশি থাকায় এখানেপলি জমার হার তুলনমূলক ভাবে কম। বাম তীরের অবস্থাসম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে পলি জমে আগেকার গভীর খাতটি যেমন ভরাট হয়েছেতেমনি ঐ সুবিশাল চরটি ২৭ফুট উচু হয়ে অর্ধেকের বেশি স্লুইসকে অকেজোকরে দিয়েছে। ৬০ফুট প্রশস্ত প্রতিটি স্লুইস দিয়ে বন্যার সময় ৩০ হাজারকিউসেক জল বেরিয়ে যাবার কথা ছিল। এখন পলি জমা বামতীরের স্লুইস দিয়ে ১৮ হাজার কিউ সেক আর ডান তীর দিয়েপ্রায় ৪২ হাজার কিউসেক জল প্রবাহিত হচ্ছে। এর ফলে যে শুধুফারাক্কা ব্যারাজের অস্তিত্বই বিপন্ন হচ্ছে তা নয় বন্যার জল সঠিকভাবেবেরবার পথ না পেয়ে ফারাক্কা উজানে গঙ্গাকে পথ পরিবর্তনের দিকে ঠেলেদিচ্ছে। মালদহ জেলায় এই যে ভয়াবহ ভাঙন, তার কারণ ফারাক্কা উজানে বামতীরে গড়ে ওঠা ঐ বিশাল চরে বাধা পেয়ে গঙ্গার বাম তীরের খাত ধরে নেমে আসাবিপুল জলরাশি মালদহ জেলাতে আছড়ে পড়ছে।গঙ্গার প্লাবন থেকে মালদহকে বাঁচাতে নির্মাণকরা হয়েছে তোফি বাঁধ। ১৯৮০সালে গঙ্গার খাতে নেমে এসেছিল ২৫ লক্ষকিউ সেক বন্যার জল। সেই জলের বেগে তোফি বাঁধে যে ফাটল ধরেছিল তারবিস্তার ছিল ১১০০০ ফুট আর গভীরতায় ৩০ ফুটেরও বেশি। তোফি বাঁধের ওপারেই পাগলা নদী। ফরাক্কাউজানে গঙ্গা - গর্ভে ভরাট হয়ে যাওয়ায় গঙ্গা যে তার পথ পরিবর্তন করতেচাইছে, এটা ছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ

দু-শো বছর আগে গঙ্গা বইতএই পাগলা নদীর খাত দিয়ে। ফারাক্কা ব্যারাজের উজানে চর ত্রমশঃ আয়তনেবৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ফারাক্কা ব্যারাজের সর্বোচ্চ জল নির্গমন ক্ষমতা (Designeddischarge capacity)২৭ লক্ষকিউ সেক। চরের জন্য সমস্তস্লুইস গেট খুলে দিলেও ১৮ লক্ষ কিউ সেকের অধিক হালে জল নির্গমন সম্ভব হচ্ছে না। এর ফলে লক্ষ লক্ষ জীবনের বিনিময়ে কোনও একপ্রবল বন্যায় গঙ্গা নদী তার পথকে পরিবর্তন করে পাগলা মহানন্দার পথধরে ছুটতে থাকবে।

কলকাতা বন্দরকেবাঁচাতে হবে ---এটা সমগ্র রাজ্যবাসীরভাবনা কিন্তু কলকাতা বন্দরকে পলি মুক্ত করতে উত্তরের ফারাক্কা গঙ্গার ৪০হাজার কিউসেক জল দেওয়ার ক্ষমতা আছে কিনা, ব্যারাজ নির্মিত হলে নদীবিজ্ঞানের নিয়মে মুর্শিদাবাদ ও উত্তরবঙ্গের মালদহে কী প্রতিত্রিয়া হবে, তাভাবার যে কোনও তাগিদ অনুভূত হয়নি, তার পেছনে আছে এক ধরনেরঔপনিবেশিক মানসিকতা।

খামখেয়ালি জলচুক্তি

১৯৯৬ সালে পশ্চিমবাংলারতৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর আগ্রহে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে জলবন্টনের যে-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তাতে দেখা যায়, গঙ্গা দিয়ে যখন ৭০,০০০ কিউ সেকেরকম জল প্রবাহিত হবে তখন ভারত ও বাংলাদেশ সমান অনুপাতে জল পাবে। যখনজলপ্রবাহ ৭০,০০০ থেকে ৭৫,০০০ কিউসেকের মধ্যে থাকবে তখন বাংলাদেশ পাবে৩৫,০০০ কিউ সেক জল। ৭৫.০০০ কিউ সেকের উপর জল প্রবাহিত হলে কলকাতাপাবে ৪০,০০০ কিউ সেক, বাকি অংশ যাবে বাংলাদেশে।

জলবন্টনের এই চুক্তিটাওবেশ অদ্ভুত। জল প্রবাহের হিসেবটা ধরা হল ১৯৪৯ - ১৯৮৮ সালের প্রবাহকেভিত্তি করে। অথচ পরবর্তী ৮ বছরের মধ্যে যে গঙ্গার প্রবাহেরপরিমাণ আশঙ্কাজনক ভাবে কমে গেছে তা রাজ্য বা কেন্দ্র কোনও সরকারেরকাছেই অজানা ছিল না।

বলা হয়েছিল, কলকাতাবন্দর যাতে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ৪০,০০০ কিউ সেক জল পায় তার জন্যই প্রায়২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ফারাক্কা ব্যারাজ নির্মাণ করা হয়েছে। অথচ সরকারের কাছে গত পাঁচ বছরেরগঙ্গা জল প্রবাহের হিসেব তাদের হাতের কাছেই মজুত ছিল। তার গড় হিসেব ছিল এরকম ঃ-----

মার্চ	০১-১০	পর্যন্ত	৬৫,০০০	কিউ সেক;
মার্চ	১১-২০	পর্যন্ত	৬০,০০০	কিউ সেক ;
মার্চ	২১-৩১	পর্যন্ত	৫৪,০০০	কিউ সেক ;
এপ্রিল	০১-১০	পর্যন্ত	৫১,০০০	কিউ সেক ;
এপ্রিল	১১-২০	পর্যন্ত	৫২,০০০	কিউ সেক;
মে	০১-১০	পর্যন্ত	৫৭,০০০	কিউ সেক;

মে	১১-২০ পর্যন্ত	৬৪,০০০	কিউ সেক ;
মে	২১-৩১ পর্যন্ত	৭২,০০০	কিউ সেক।

অর্থাৎ কলকাতার কপালেজুটবে ৩৮৫৯০ কিউসেকের পরিবর্তে২৯,০০০ কিউ সেক জল।

এই ৮ বছরের ব্যবধানে গঙ্গার জলপ্রবাহ কী পরিমাণ কমে গেছে তাসরকার প্রদত্ত হিসাব থেকেই স্পষ্ট হয়েযায়। এর কারণও অজানা নেই। বিহার ওউত্তরপ্রদেশে ৪০০ টিরও বেশি ক্ষেত্রেলিফ্ট্ ইরিগেশনের মাধ্যমে যে পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে তার পরিমাণ ২৫,০০০ কিউ সেক থেকে৪৫,০০০ কিউ সেক। এই সেচ কেন্দ্রগুলি ছাড়াও বিহার ও উত্তরপ্রদেশে আরও নানাপ্রকল্পের মাধ্যমে গঙ্গার জল টেনে নেওয়া হচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষারেরআগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার মরফতউত্তরপ্রদেশ এবং বিহার সরকারের কাছ থেকে গঙ্গার জল ব্যবহারেরপ্রশ্নে সুনির্দিষ্ট গ্যারান্টি কেন চাওয়া হল না, সেটা কিন্তুরহস্যই থেকে গেল।

পাছে গঙ্গার জলপ্রবাহনিয়ে এই চুক্তি রূপায়ণে কোনও বাধা আসে সম্ভবত সেই দিক থেকে দৃষ্টিসরাতে, ভুটান থেকে উৎপন্ন উত্তরবঙ্গের উপর দিয়েপ্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে পতিতসঙ্কোশ নদী প্রকল্পের কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করে দিলেন।আন্তর্জাতিক একটা নদীকে নিয়ে এরকম ভাবে একতরফা কোনওপ্রকল্পের কথা ঘোঘণা করা যায় কিনা সেই প্রশ্নকে মুলতুবি রেখেই বলা যায়, এইঘোষণার মধ্যেও সেই ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাই প্রকাশ পায়।উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রশ্নটি উপেক্ষিত হচ্ছে বলে যেখানেবার বার অভিযোগ উঠছে, তখন প্রায়
৭০০০ কোটিটাকা ব্যায়ে ১৪৩ কিমি দীর্ঘ খালকেটে উত্তরবঙ্গের বুক থেকে জল টেনে নেওয়ার শোষণের অভিযোগটিও উঠেআসে। কারণ মালদহের অস্তিত্বকে বিসর্জনের কিনারায় ঠেলে দিয়ে ফারাক্কাব্যারাজের সাহায্যে কলকাতা বন্দরের পলি ঠেলে দিতে ব্যর্থ হবার পর, এবারযদি সঙ্কোশ পরিকল্পনা রূপায়িত করা হয়, তবে উত্তরবঙ্গের ৪৫ টিচা -বাগান সহ যে-সমস্ত সংরক্ষিত বনভূমি বিনষ্ট হবে, তার মধ্যে জলদাপাড়াঅভয়ারণ্যও পড়বে। সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে তিস্তা প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজ দেখে ক্লান্ত উত্তরবঙ্গবাসীরাযদিও এখন আর বিশ্বাস করে না এই ধরনের কোনও পরিকল্পনাবাস্তবায়িত হবে, তবে ঘরপোড়া গর মতো এই ধরনের কোনওপরিকল্পনার ঘোষনাই তাদের আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। তাদের ধারণারাজধানী কলকাতার জন্য পশ্চিমবাংলার অভিভাবকেরা উত্তববঙ্গকে বলি দিতেকোনও দ্বিধা করবে না।

বঞ্চিত উত্তরবঙ্গ

লোকসংখ্যারবিচারে উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যা এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৫শতাংশ। এই এলাকার জন্য যে পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সারা রাজ্যের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাত্র তিন শতাংশ। বিদ্যুৎউৎপাদন ও তার ব্যবহার একটা অঞ্চলের উন্নতির সূচক বলে গণ্য হয়।উত্তরবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদনের এই হার থেকেই বোঝা যায় এই এলাকা উন্নয়নের প্রশ্নে কতপিছিয়ে আছে। ক্ষুদ্র শিল্পে রাজ্য সরকার যে অনুদান দেয় উত্তরবঙ্গ পায় মোট বরাদ্দের মাত্র ৯ শতাংশ। দক্ষিণবঙ্গেযখন প্রতি লক্ষজনসংখ্যায় ১৯০৬জন শিল্পে নিযুক্ত হবার সুযোগ পায়, সেখানে উত্তরবঙ্গে এই সংখ্যা মাত্র ৩৪৯ জন।সারা রাজ্যে শিক্ষিতের গড় হার যখন ছিল ৪০.৯ শতাংশ তখন উত্তরবঙ্গে এইঅনুপাত ছিল ৩০.৩ শতাংশ। কলকাতাবিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ৯৬টি বিষয়ে পড়ানো হত তখন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রীরা পেত মাত্র ১৬টি বিষয়ে পড়ার সুযোগ।

এই অঞ্চলের ছাত্ররাপাঠ্য বইতে নদীর বহুমুখী পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণপরীক্ষার জন্য মুখস্ত করে। তারা জানে দামোদর, ময়ুরাক্ষী,রূপনারায়ণের মতো বহুমুখী পরিকল্পনাগুলি কীভাবে গঙ্গার ওপারেবর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী জেলার অহল্যা মাটিকে স্বর্ণগর্ভা করে তুলেছে।

উত্তরবঙ্গেরনদীগুলি তো তাদের কাব্যিক নামের গুণে সাহিত্যের ছন্দ মেলানোর মধ্যেসীমাবদ্ধ থাকার কথা ছিল না। উত্তরবঙ্গের বন্ধ্যা জমিকে ফলবতী করতে তাদের বিপুল জলরাশিও উন্মুখহয়ে আছে। তবু কেন এই বিশাল অঞ্চলে কৃষিভূমির ২০.৪৭ শতাংশ মাত্র জল সম্পদেরস্পর্শ পায় ? ë×M রবঙ্গের তিস্তা প্রকল্পের কাজ শু হয়েছিল ২৩ বছর আগে। কবে শেষ হবে এখনও কেউ জানে না। এর জন্যই বরাদ্দ টাকা গঙ্গারওপারের কর্মসূচীর জন্য অম্লান বদনে খরচ করে ফেলা যায়। এখন পর্যন্তএই প্রকল্প কিছু প্রভাবশালী ঠিকাদার, রাজনৈতিক নেতা ওকিছু অসাধু সরকারি কর্মচারীদের পকেট ভারি করার সুযোগ দেওয়া ছাড়াসাধারণ মানুষের কাছে আর কোনও বিশেষ নজর কাড়তে পারেনি। অন্যদিকে এই প্রকল্পকেকেন্দ্র করে জাঁকিয়ে বসেছে জমি কেনাবেচার এক শক্তিশালী চত্র। জমিকেনা-বেচায় ভবিষ্যতে লাভ হবে, এই ফাটকাবাজিতে এরা কৃষিজমিগুলিকে কিনে পতিত করে রাখছে। কোনও চাষের কাজ করছে না বা করতে দিচ্ছে না, পাছেকৃষকেরা জমির ভাগ চেয়ে বসে।

ব্যবসারবাড়তি জ্বালা ঃ

এক ফসলাজমিগুলিতে শু হয়েছে চা গাছ রোপনের প্রতিযোগিতা। এর কিছুদিনআগে শু হয়েছিল আনারস চাষের উন্মত্ত প্রয়াস । একশ্রেণীর মধ্যবিত্ত ওউচ্চবিত্ত, কৃষকদের কাছ থেকে জমি কিনে শু করেছিল আনারসের চাষ তখনএই এলাকার দিগন্ত বিস্তৃত জমিতে শুধু আনারস আর আনারস। অথচ ফলের চাষের পাশাপাশি গড়ে উঠল না কোনও ফ্রুটপ্রসেসিং শিল্পের পরিকাঠামো। অপরদিকে, কৃষি জমিগুলিতেআনারস লাগিয়ে তাতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে প্রথমে ৩-৪বছর প্রচুর ফলন পেলেও সেই জমি রাসায়নিক বিষে তার মৃত্যুকেঘোষণা করতেই আনারস চাষে এল মড়ক। কৃষকেরা এর আগেই জমিহারিয়েছিল। এবার সর্বস্বান্ত হল অসংখ্য মধ্যবিত্ত মানুষ যারা আনারসের রঙিনমুকুটের হাতছানি দেখে রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে এখানকারমাটির চরিত্র ও জল বায়ুর কথা বিবেচনা না করেই আনারস চাষে ঝাঁপিয়েপড়েছিল।

একইভাবে অনেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে চা বাগানের নেশায়। চা চাষের জন্য দরকার বিশেষজলবায়ু ও মাটি। না হলে তো কলকাতাতেই চা চাষ করা যেত। এ রাজ্যে প্রথম চা গাছেরচারা কিন্তু বপন করা হয়েছিল কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে। সেগুলিবাঁচেনি। অথচ ক্যাম্বেল দার্জিলিং-এ তার বাংলো বাড়িতে ঐ একই গাছ নিছক শখকরে লাগাতেই সেগুলি তরতরিয়ে বংশ বৃদ্ধি করে বসল। স্বাদে-গন্ধে পৃথিবী জয় করে নিল। উত্তরবঙ্গেরযত্রতত্র যেভাবে কৃষি জমিকে চা চাষে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, ব্যাপক রাসায়নিক সারপ্রয়োগ করে চা পাতা বৃদ্ধি করে রাতারাতি বড়লোক হবার জুয়াখেলায় অনেকেমেতে উঠেছে তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেএর মধ্যেই ফুটে উঠেছে ।

চাচাষের জন্য জমি থেকে কৃষক উৎখাত হয়ে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরে পরিণতহচ্ছে। এক ফসলা জমির মালিকেরা তৎক্ষণাৎ কিছু নগদ প্রাপ্তির আশায়তাদের জমিগুলো নতুন চা বাগান শিকারীদের কাছে বিক্রি করে সেই বাগানেই কিছুদিন দিন-মজুরের কাজ পাচ্ছে। যারা জমি বিক্রি করতে চাইছে না তারাও কিছু দিনপরে জমি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। এই জমি কেনা বেচা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক হিংস্র জমির দালালিরমাফিয়া গোষ্ঠী। ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতারা এদের নিরাপদপোতাশ্রয়। এদের দাপটে জমি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে অনেকেই। আবার যারা এই সব চাপউপেক্ষা করছে তারাও জমির চারপাশে যারা বাগান করেছে তার মধ্যেবিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপের মতো টিঁকে থাকতে পারছে না। সেকানকার ব্যবহৃত রাসায়নিকসার এবং কীটনাশক দ্রব্য ধানচাষের সহায়ক জৈব উপাদানগুলিকে ধবংস করেজমির উৎপাদিক শক্তিকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে।

এইভাবেউৎপন্ন চা বাগান পরিবেশকে যেমন ধবংস করেছে চায়ের মানকেওতলানিতে টেনেআনছে। এইভাবে অপরিকল্পিত ও অবৈজ্ঞানিক ভাবে গজিয়ে ওঠা চাবাগিচাগুলি কাঁচাপাতার দাম না পেয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে। জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসা এখানে দিনমজুরের কাজেনিযুক্ত মানুষেরা (যাদের প্রায় সবাই স্থানীয় ভূমিপুত্র রাজবংশীসম্প্রদায়) জি হারিয়ে আবার পেটের তাগিদে বেরিয়ে পড়েছে। একমাত্রশিলিগুড়ি শহরেই আাছে ৪০,০০০-এর মতো রিক্সা। অধিকাংশ চালকই রাজবংশীযা কয়েক বছর আগেও এখানেদেখা যেত না। এই ভিড় সারা উত্তরবঙ্গেই বেড়ে চলেছে। এর কারণ যে জমি হারিয়েজীবিকার তাগিদে শহরের ভিড়ে সামিল হওয়া, এতে কোনও সন্দেহনেই।

বহুদিন ধরেতিল তিল করে গড়ে ওঠা সুনামগুলি পরিকাঠামো ও বৈজ্ঞানিকদৃষ্টিভঙ্গির অভাবে যেধবংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে তার উদাহরণ দার্জিলিং -এর চা এবং মালদহের আম। চা শিল্প এইএলাকার উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেতার জীবন্ত উদাহরণ হচ্ছে জলপাইগুড়ি শহর । চা বাগিচার সদরদপ্তরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল আজকের জলপাইগুড়ি শহর। চাবাগিচার সেই মালিকানার হস্তান্তরের সঙ্গে সদর দপ্তরগুলিও জলপাইগুড়ি থেকেস্থানান্তরিত হয়ে যাওয়ার ফলেই জলপাইগুড়ি শহর আজ মুমূর্ষুশহরে পরিণত হয়েছে।

ব্রাজিলেরআম আজ বিশ্বের বাজারে প্রভুত্ব বিস্তার করেছে। এর কারণ সেইদেশটি তার উন্নত কারিগরি কৌশলেরসাহায্যে আমকে ছোট টুকরোয়হিমায়িত করে তাকে টিনজাত করেবিশ্বের বাজারে বিপুল সাড়া পেয়েছে। অথচ মালদাহের আম যে পিছু হটতেহটতে প্রতিযোগিতার বাজারে একেবারে শেষের সারিতে এসেদাঁড়িয়েছে, তার কারণ---- অনুসন্ধানও প্রতিকারের তাগিদের অভাব

শিলিগুড়ির চা- নিলাম কেন্দ্রকে ঘিরে যে বিশাল উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল তার ছিটেফোঁটাচিহ্নও আজ নেই। এখনও শহরের বিভিন্নজায়গায় সাইট ফর টি ওয়ারহাউস -এর বিজ্ঞাপন - গুলি সেই উদ্দীপনাকেবিদ্রূপ করতেই যেন টিকে আছে। অথচ এমন হবার তো কথা ছিল না। অসম সরকারআমিন গাঁত্ততে ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো স্থাপন করতে পারলে এইরাজ্যের চা উৎপাদন কেন্দ্র শিলিগুড়ি বা জলপাইগুড়িতে পশ্চিমবঙ্গসরকার এই ধরনের একটা উদ্যোগ কেন নিতে পারলনা ।

উত্তবঙ্গেরভবিষ্যত কী ----

এবার কথা উঠেছে,বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে কলকাতা সহ সারা ভারতবর্ষ থেকে উত্তরপূর্বভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে পণ্যসামগ্রী পরিবহনের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গেচুক্তিবদ্ধ হতে হবে। আগে কয়েক বছরের মধ্যে হয়তো তা হয়েও যাবে। কারণ, বিশ্বায়নের যুগে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার একচ্ছত্র শক্তিশালী ভারতবর্ষের চাপক্ষুদ্র ও আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের পক্ষে সহ্য করাসম্ভব হবে না। এতে কম সময়ে এবং তুলনামূলক ভাবে কম পরিবহন খরচে উত্তর -পূর্ব ভারতে সামগ্রী সরবরাহ করা গেলেও উত্তরবঙ্গের অর্থনীতি কিন্তু ভেঙেপড়বে । কারণ, উত্তবঙ্গের কোথাওকোনও শিল্পের চিমনি দেখা না গেলেও উত্তরপুর্ব ভারতের প্রবেশদ্বারবলে এই অঞ্চল ব্যবসায়ী এলাকা রূপে গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ দিয়ে পরিবহন ব্যবস্হা চালু হলে এখানকার ব্যবসাকেন্দ্রে উত্তরপূর্বভারতে সরবরাহ করার জন্য পণ্যসামগ্রী পাঠাবার প্রয়োজন থাকবে না। উত্তরবঙ্গের রাণিজ্যিক গুত্ব তলানিতে গিয়ে ঠেকবে।উত্তরবঙ্গ হবে অর্থনীতির শুষ্ক মভূমি। তবে আশার কথা, নাথুলা গিরিপথ দিয়েচীনের সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপিত হলে উত্তরবঙ্গ, বিশেষ করে শিলিগুড়ি শহর, তার অর্থনৈতিক মৃতুর হাত থেকে বাঁচার একটা শক্তিশালী পথখুঁজে পাবে।

উত্তরবঙ্গেরউন্নয়নের প্রশ্ন যখন কোনও অভিমান ক্ষোভে পান্তরিতহয়ে কখনও গোর্খল্যান্ড, কখনও বা কামতাপুরী আন্দোলনের মাধ্যমে ফেটে পড়তেচাইছে তখন মালদহ জেলায় গঙ্গার এই ভাঙনে সর্বহারা মানুষের হাহাকারগোর্খল্যান্ড, কামতাপুরী দাবীর মধ্যে সমমর্মিতার স্পর্শ পেতে পারে। আজউত্তরবাংলার উন্নয়নের প্রশ্নে গঙ্গা ভাঙন এমন এক ভয়াবহ সমস্যা রূপে হাজির হয়েছে, যা আগামী দিনে প্রাকৃতিক সমস্যা ও গঙ্গার দক্ষিণপাড়া বিরোধী ভাবনা পরস্পর হাতধরে এগিয়ে যেতে চাইতে পারে।

প্রশ্ন উঠেছে, ফারাক্কা ব্যারাজমারফত ভাগরথী-হুগলী দিয়ে প্রবাহিত করে তো কলকাতা বন্দরের সমস্যা মেটানো সম্ভব হলনা। তবে ব্যারাজকে রেখে মালদহকে গঙ্গাগর্ভে বিলীন করে দেওয়া হবে কেন

আজ তাইউত্তরবঙ্গের উন্নয়নের প্রসঙ্গে এই এলাকার জাতিসত্তা প্রতিষ্ঠার(কামতাপুর / গোর্খল্যান্ড) মধ্যে যে
বিচ্ছিন্নতারবিপদের কথা শোনা যেত, মালদহের ভাঙনে এখন তাদের ছাপিয়ে সর্বক্ষেত্রে আলোচনার বিষয় হয়েদাঁড়িয়েছে। গঙ্গার এই ভাঙন যে আগামী দিন উত্তর ও দক্ষিণের ভাঙন হয়েদাঁড়াবে না, তার কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না।
কারণ, ১৯৮৮ সালেপ্রকাশিত জেলাগেজেটিয়ার থেকে যাচ্ছে ওই বছর পর্যন্ত মালদহ জেলায় ভাঙনের মত কোনওপ্রাকৃতিক ঘটনা ঘটেনি। ব্যাপক প্লাবনের উল্লেখ আছে ৩৫ বছরেরমধ্যে মাত্র ৩টি। গঙ্গাতীরের অসংখ্য ছোট বড় গ্রামে ভাঙনের কোনও উল্লেখওগেজেটিয়ারে নেই। তাই ফরাক্কা ব্যারাজের মতো মনুষ্য সৃষ্টিকারীবাধার জন্যই যে আজ মালদহ জেলার এই সর্বগ্রাসী ভাঙন, এই বিশ্বাসটিই দৃঢভাবেদানা বেঁধে চলেছে। সর্বোপরি, য়ে প্রশ্নটা এখন উঠে এসেছে তা হল,ফারাক্কা ব্যারাজ তো মালদহ তথা উত্তরবঙ্গর উন্নয়নের জন্য করা হয়নি, তবেকেন দক্ষিণবঙ্গের উন্নয়নের এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মালদহকে দধীচির মতো অ

াত্মত্যাগকরতে হবে ?

উত্তর ওদক্ষিণের মধ্যে এই ভাঙনকে খতে তাই ব্যারাজের পরিবর্তে তাকেসেতুতে রূপান্তরিত করে উত্তর ও দক্ষিণের সেতুবন্ধনের কথাভাবতে হবে। গঙ্গাকে ফরাক্কা ব্যরাজের বন্ধন থেকে ও ভাগীরথীকে জঙ্গীপুরব্যারাজের বন্ধন থেকে মুক্ত করে এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করা যেতেপারে। এতে কিন্তু কলকাতাকে কোনও ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না।ভাগীরথীর উৎসকে ধুলিয়ান শহরের দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত গঙ্গারএকটা বাঁকে যুক্ত করলে গঙ্গা র জলধারাতার দক্ষিণমুখী পূর্বলব্ধ গতি(Inertia of flow) নিয়ে ভাগীরথীর খাতে বয়েযেতে পারবে। উ ৎসস্থলে বন্যারগতি সেকেন্ডে১৬ ফুটের বেশি থাকায় ১ হাজার ফুট বিস্তৃত ও ২৫ ফুটগভীর খাত দিয়ে ৪ লক্ষ কিউসেক জল প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। এছাড়া ভাগীরথীর উৎস থেকেত্রিবেণী পর্যন্ত সর্পিল ২০০ মাইল পথের ৭৫ মাইল সংস্কারসাধন ঘটিয়ে একেসরলায়িত করে ১২৫ মাইলে কমিয়ে আনা সম্ভব। খরচ পড়বে বন্যার ধবংসেরতুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র।

এর ফলে বাঁচবেমালদহ জেলা। কলকাতা বন্দরপাবে জল। বাঁচবে উত্তর ওদক্ষিণের সংহতি। এই সংহতি তোউত্তর ও দক্ষিণের মানুষের স্বার্থেই উভয় খন্ডের মানুষেরঅন্তরের চাহিদা। আমেরিকার সর্বগ্রাসী প্রভুত্ববাদের বিদ্ধে যেমনঅন্য আমেরিকার শুভচেতনা সম্পন্ন মানুষই প্রধান হাতিয়ার, উত্তরেরবঞ্চনার ক্ষোভ প্রশমনে দক্ষিণবঙ্গের মানুষে র বাড়ানো হাতই তো সবচেয়ে বড় শক্তি। একই সঙ্গে তাই আওয়াজ উঠুক---- মালদহ বাঁচাও, বাঁচাও আমাদের সংহতি।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home